সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা এবং ধর্মের উপলব্ধি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যে আনুষ্ঠানিকতা ধর্মের উপলব্ধিকে স্পর্শ করে না সে আনুষ্ঠানিকতা প্রাণহীন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ঠুর হতে বাধ্য।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

শ্রাবণ ১৪২৩, জুলাই ২০১৬ শাওয়াল ১৪৩৭

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

আলোর আলো, রূপহীন রূপ

আমীন : হুজুর, আপনি প্রায়ই বলেন, সত্যের একটা আপাত সহজ আবরণ থাকে। এই সহজ আবরণটির পেছনে যে গভীরতা, সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু সত্যের যিনি প্রেমিক তিনি সে গভীরতার পরিমাপ করবেনই– কারণ তার সত্যকে চাই– সহজ আবরণের পেছনে লুকিয়ে থাকা রহস্যকে চাই। কুরআনে সুরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে, ক্বাদ জা'আকুম মিনাল্লাহে নুরুন ওয়া কিতাবুম মুবিন– এর পেছনে গভীরতর সত্যটি কী? সাধারণ অর্থ করলে দাঁড়ায়– তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। কিন্তু এই আপাত অর্থের আড়ালে কি আর কোনো কথা লুকিয়ে আছে?

গুরু : দেখো, কুরআনের অর্থের সাতটি পর্দা আছে। অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থের বিশ্লেষণ করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখবে, এখানে মূল শব্দটি হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। আল্লাহর কাছ থেকে নূর এসেছে তোমাদের জন্য। এর সঙ্গে সুরা নূর-এর ঐ আয়াতটি মিলিয়ে পড়ো যেখানে আল্লাহ নিজেকে সংজ্ঞায়িত করছেন। আল্লাহ কী? আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ– আল্লাহ হচ্ছেন এই আসমান ও জমিনের নূর। এর সঙ্গে রাসুলে পাকের (সা.) হাদিস মিলিয়ে পড়ো– আনা মিন নূরিল্লাহ ওয়া খালাকা কুল্লুহিম মিন নূরি– আমি আল্লাহর নূর থেকে এবং এ ব্রহ্মাণ্ড আমার নূর থেকে তৈরি। এখানে তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, রাসুলে করিমের (সা.) হাকিকত কী? প্রকৃতপক্ষে তিনি কী? আমরা সাধারণ অর্থে তাকে নবী বা রাসুল বলেই জানি। কিন্তু নবীদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা ভিন্ন– সে কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন হযরত ঈসা এবং হযরত মুসার মতো নবী। ভুলে যেও না, হযরত ঈসা তাঁর আগমনের সংবাদ জানিয়ে বলছেন– আমি তার জুতার ফিতা বাঁধারও যোগ্য নই। [গসপেল অব বার্নাবাস, অধ্যায় ৪৪] তোমাকে আরো মনে রাখতে হবে, এখানে নূর সৃষ্টি করা হয়েছে– এ কথা বলা হয়নি। বলা হয়নি তোমাদের জন্য একজন নবী পাঠানো হচ্ছে। বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য পাঠানো হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে নূর এবং একটি স্পষ্ট কিতাব। সেই নূরকে আল্লাহ কুরআনে হুকুম করলেন– 'বলুন, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের মতোই মানুষ'। কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম [সুরা কাহফ/১১০]। মানুষের লেবাসে সে নূর মানুষের সাথে বিচরণ করেছে বলেই তাঁকে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ভাবার কোনো কারণ নেই। কিছু লোক তাই ভাবে, যেমন ভেবেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। কিন্তু তাদের সম্পর্কেও কুরআন চুপ করে নেই। বলা হলো– ওরা রাসুলদের তাদের মতোই মানুষ বললো সুতরাং 'ফাকাফারু' অর্থাৎ তারা কাফের হয়ে গেলো [সুরা তাগাবুন, আয়াত নং-৬]। অন্যদিকে আল্লাহই বলছেন– যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে [সুরা ফাতাহ, আয়াত নং-১০]। চেয়ে দেখো, তাঁর হাতকে আল্লাহ নিজের হাত বলছেন। অতএব আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কাছ থেকে নূর এসেছে– এ কথাটিকে খুব সহজভাবে নেবার কোনো পথ নেই। লক্ষ করে দেখো, কিতাব এবং নূর দুটিকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর নূরের বাস্তব রূপ হচ্ছেন মুহম্মদ (সা.), আল্লাহর বাণীরও বাস্তব রূপ হচ্ছেন মুহম্মদ (সা.)। এমন নবীর হাকিকত না বুঝে যারা তাঁকে কেবল মানুষ হিসেবে দেখতে চান তাদের সে দেখার মধ্যেও ভুল আছে– দৃষ্টিভ্রম আছে। তারা মানুষ মুহম্মদ (সা.)-কে ভালো করে দেখেছেন তেমনটাও মনে হয় না।

আমীন : এ কথা বলছেন কেন হুজুর? নবীকে মুসলমান মাত্রই ভালোবাসে।

গুরু : ভালোবাসে– কিন্তু ঠোঁটে ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করা এবং হৃদয়ে ভালোবাসাকে ধারণ করা দুটো এক জিনিস নয়। একজন বিধর্মী রাসুলে করিমকে যেরূপ শ্রদ্ধা এবং প্রেমে আপ্লুত হয়ে দেখেন সে রূপে অনেক মুসলমানও দেখেন বলে মনে হয় না।

আমীন : আপনি কার কথা বলছেন, হুজুর?

গুরু : কেন, স্টেনলি লেনপুলের বইটি পড়োনি। চেয়ে দেখো, রাসুলে পাকের (সা.) চেহারার কী অদ্ভুত মর্মস্পর্শী বর্ণনা– `Muhammad was of middle height, rather thin but broad of shoulder, wide of chest, strong of bone and muscle. His head was massive, strongly developed. Dark hair, slightly curled, flowed in a dense mass almost to his shoulders, even in advanced age it was sprinkled with only about twenty grey hairs, produced by the agonies of His 'Revelations'. His face was oval shaped. Slightly tawny of colour. Fine long arched eye-brows were divided by a vein, which throbbed visibly in moments of passion. Great black restless eyes shone out from under long heavy eyelashes. His nose was large, slightly aquiline. His teeth, upon which he bestowed great care, were well set, dazzling white. A full beard framed his manly face. His skin was clear and soft, his complexion 'red and white'. His hands were as 'silk and satin', even as those of woman. His step was quick and elastic, yet firm as that of one who steps 'from a high to a low place'. In turning his face, he would also turn his whole body. His whole gait and presence

was dignified and imposing. His countenance was mild and pensive, His laugh was rarely more than a smile.

[Lane-Pool, Stanely. The Introduction to the Speeches and Tabletalk of the prophet Muhammad. London. 1882]

'মুহম্মদ ছিলেন মাঝারি গড়নের– দেহ একহারা কিন্তু তাঁর কাঁধ ছিল প্রশস্ত, শক্ত হাড় এবং পেশল বুকের ছাতি ছিল চওড়া। সুদৃঢ় মস্তক ছিল বিশাল। ঘন কালো ঈষৎ কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত ছিল প্রলম্বিত। পরিণত বয়সেও মাত্র বিশটি সাদা চুল সারা মাথায় ছড়িয়ে ছিল। ওহি গ্রহণের সময় তাঁর দেহে যে তীব্র যন্ত্রণা হতো এ ছিল তারই স্বাক্ষর। ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূর মাঝখানে ছিল একটা মোটা শিরা যা উত্তেজনার মুহূর্তে দপদপ করতো। চোখের পাতার দীর্ঘ পাপড়ির আড়াল থেকে বড় বড় কালো দুটি চোখ জ্বলজ্বল করতো। তাঁর নাক ছিল দীর্ঘ, কিছুটা বাঁকানো। তাঁর দাঁত ছিল উজ্জ্বল ঝকঝকে এবং সুদৃঢ়– দাঁতের তিনি বিশেষ যত্ন নিতেন। তাঁর পৌরুষদীপ্ত মুখ জুড়ে ছিল চাপদাড়ি। তাঁর ত্বক ছিল নরম এবং মসৃণ। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল লালচে শুভ্র। তাঁর হাত ছিল রেশম ও মখমলের কমনীয়তায় ভরা, অনেকটা নারীর হাতের মতো...। তাঁর পদক্ষেপ ছিল দ্রুত কিন্তু ছন্দময়– তবু সে পদক্ষেপে ছিল উঁচু থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার দৃঢ়তা। মুখ ফেরালে তিনি দেহও ফেরাতেন। তাঁর চলনভঙ্গি এবং সমগ্র অবয়বে ছিল সুললিত গাম্ভীর্য। তাঁর চেহারায় ছিল একটা গভীর কমনীয়তা। তাঁর মৃদু হাসি কখনই শিষ্টাচারের সীমানা ছাড়িয়ে উচ্চকিত হতো না (অনুবাদ মৎকৃত)।

তোমরা যারা তাঁকে মানুষ বলো– তাদের কেউ কি এমন মহব্বতের সঙ্গে তাঁর চেহারার বর্ণনা দিয়েছো, নাকি কখনও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে মহব্বতের সঙ্গে দেখার চেষ্টা করেছো? লেনপুল বলেছেন– তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ, তাঁর মন ছিল আকাশের মতো উদার– তাঁর অনুভূতি ছিল কোমল এবং সূক্ষ্ম। তাঁর অনুচরদের তিনি সতত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, তাদের কখনও তিরস্কার করতেন না। তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন– রাস্তায় শিশুদের দেখলে তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন। কাউকে তিনি অভিশাপ দিতেন না। তিনি বলতেন– 'আমি তো মানবকুলের জন্য রহমত হয়ে এসেছি। আমি তো তাদের অভিশাপ দিতে আসিনি'। তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন, কেউ মারা গেলে তার কফিন কাঁধে বহন করতেন। ক্রীতদাসদের আমন্ত্রণও তিনি সানন্দে গ্রহণ করতেন। নিজের কাপড় তিনি নিজে রিপু করতেন। ছাগীর দুধ দোহাতেন। নিজের সব কাজ নিজেই করতেন।

এই হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবীর হাস্তি। তাঁকে তো আমরা মানুষ হিসেবেও তাঁর প্রকৃত রূপে দেখি না– দেখার চেষ্টা করি না, তাঁর হাকিকত তো অনেক দূরের কথা। হাকিকতের মানে এই নয় যে, তোমরা মুহম্মদকে (সা.) আল্লাহ বলে জানবে। তিনি আসলে কী, সেটা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ আল্লাহই, মুহম্মদ (সা.) মুহম্মদই। আল্লাহ যেমন লা-শরিক, মুহম্মদও (সা.) তেমনি তুলনাবিহীন। তবে আমি এখানে তোমাদের দেখাতে চাইলাম একজন বিধর্মী কতটা মহব্বতের সাথে তাঁর ছবি আঁকতে পারে। হুজুর পাক (সা.) সম্পর্কে লা মার্টিনের সে বিখ্যাত উক্তির কথাও স্মরণ করো– 'As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?'

[La Martine. Histoire de la Turquie, Paris 1854, P-277]

আমীন : হুজুর, আল্লাহ নিজে নূর, কিন্তু তিনি কি সত্যি নিরাকার? তাই যদি হয় তাহলে তার হাত, চোখের কথা কুরআনে বলা হচ্ছে কেন?

গুরু : আল্লাহ অবশ্যই নিরাকার। তার হাত, চোখ ইত্যাদির কথা রূপকার্থে বলা হয়েছে। কিন্তু নিরাকারেরও একটা আকার আছে। আল্লাহ শব্দের তো কোনো অর্থ নেই। একটা নিরাকার অস্তিত্বের নাম আল্লাহ। কিন্তু এই দেখো আমি নিরাকার 'অস্তিত্ব' বলছি, সত্যিকারের নিরাকার বলে তো কিছু নেই। নিরাকার কথাটা একটা শব্দ। শব্দটা উচ্চারণ করলেই সে শব্দের পেছনে একটি রূপ আসবে। শব্দটা ঐ রূপের প্রতীক। হোক না সে রূপ রূপহীন। শব্দ মাত্রই হচ্ছে প্রতীক। এ প্রতীকগুলো দেশ থেকে দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু প্রতীকের পেছনে লুকিয়ে থাকা রূপটির তাতে কোনো ইতরবিশেষ হয় না। এই যেমন ধরো, চীনারা আল্লাহকে বলে 'শাঙটি', হিন্দুরা বলে 'ভগবান', খ্রিস্টানরা বলে 'গড', মুসলমান বলে 'আল্লাহ', ইহুদিরা বলে 'ইলয়'– শব্দ কিন্তু ভিন্ন, অর্থাৎ প্রতীক ভিন্ন। প্রতীকের পেছনে রূপ কিন্তু এক। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দুরা যখন ভগবান বলে তখন মুসলমানের আল্লাহ কি বলে ওঠেন– না, তোমার এ ডাকে আমি সাড়া দেবো না, আমাকে আল্লাহ বলে ডাকো। তিনি কি তাদের সে ডাক শোনেন না? কিংবা একজন খ্রিস্টান যখন 'গড' বলে তখন কি তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন? ভুলে যাও কেন ধর্মের এ ভেদাভেদ তো তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই মানুষকে একটি পুরুষ এবং একটি নারী থেকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়। [সুরা হুজুরাত, আয়াত নং-১৩]। এ বিশ্বে তাঁরই লীলা চলছে সর্বত্র। আর এ জগতের অর্থাৎ সারা বিশ্বের রহমত করে যাঁকে তিনি পাঠিয়েছেন তাঁরই নাম মুহম্মদ (সা.)। ঐ বহুরূপী আল্লাহকে যারা চেনে তারা আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকে না। [মান আরাফাল্লোহো লা ইয়াকুলু আল্লাহ]। শব্দের গণ্ডি ভেদ করে তারা বুক ভরে ঐ সীমাহীন শূন্যতাকে পেতে চায় যার আনন্দ অনুভূতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ ব্রহ্মাণ্ড। কারো কারো রথ চলেছে ঐ সীমাহীন শূন্যতার দিকে ধেয়ে। আবার যারা মুহম্মদের (সা.) নূরে প্রত্যক্ষ করেছে শূন্যতার পরিপূর্ণ রূপ, তারা মুহম্মদের (সা.) প্রেমেই বিলীন হতে চায়– তাঁর প্রেমেই পেতে চায় সেই নামহীন, রূপহীন আরাধ্যকে। এই অরূপকে উদ্দেশ্য করে প্রেমিক কবি বলেন :

তেরা হুসন সে মুঝে কেয়া গরজ
তেরি যাত সে মেরা ইশক্ হ্যায়
তুঝে দেখনে কি হ্যায় আরজু
তু খেজা মে হো কে বাহার মে।

তোমার রূপে আমার নেই কোনো ঔৎসুক্য
তোমার রূপহীন সত্তার প্রেমে আমি আকুল
তোমাকে দেখার বাসনা তাই এমন প্রবল
তা তুমি ফাল্গুনেই থাকো কিংবা বিবর্ণ বৈশাখে।

[অনুবাদ : মৎকৃত]

নারীদের মসজিদে যেতে বারণ নেই

কুলসুম রশীদ

শুক্রবারকে সপ্তাহের ঈদ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। দিনটির মাহাত্ম্য নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে প্রচুর তথ্য রয়েছে। দিনটিকে উদযাপন করার জন্য বৃহস্পতিবার থেকে প্রস্তুতি নিতে থাকেন মুমিন বান্দারা। শুক্রবার এলে আমার হৃদয়ে কেমন যেন এক সাড়া পড়ে যায়। সপ্তাহান্তে এ দিনটি খুবই আনন্দঘন পবিত্র পরিবেশে কাটানোর পর হৃদয়ে এক প্রশান্তির ভাব আসে। তার রেশ চলে সপ্তাহের বাকি ছয়টি দিন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে শুক্রবারে মসজিদে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য জানাই তাঁর মহান দরবারে শত-কোটি সেজদা।

মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে অনেকেই কুরআন ও হাদিসের নিজের মতো ব্যাখ্যা করে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। এর ফলে সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা হচ্ছে। পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মায়ের সংস্পর্শে সন্তানের সময় কাটে বেশি। সন্তান জীবনের সর্বপ্রকার ব্যবহারিক শিক্ষা পায় মায়ের কাছেই। তাই মাকে সর্বগুণে গুণান্বিত হতে হবে। ধর্ম মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন পদ্ধতি শেখায়। অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য তাকে ধর্মশালায় যেতেই হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নারী-পুরুষ ধর্মশালায় আসা-যাওয়া করে থাকেন, অথচ আমাদের সমাজে পর্দা প্রথার দোহাই দিয়ে নারীকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তবে সংসারের আয়-উন্নতির বেলায় এ নিয়মটি প্রয়োগ করা হয় না। চাকরি, ব্যবসা, বাজার করা থেকে শুরু করে সব রকমের কাজে তাদের বাধা প্রদান করেন না অভিভাবকরা।

রাসুল (সা.) নারীকে পর্দা মেনে বিভিন্ন রকম পেশায় নিয়োজিত থাকতে উৎসাহিত করেছেন। মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে বলেছেন : 'তোমাদের স্ত্রীরা যখন তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তাদের বাধা দিও না।' বর্তমানে কিছু মানুষের গোঁড়ামির কারণে মেয়েদের খাঁচাবন্দি করে রাখা হচ্ছে। অথচ ইউরোপ-আমেরিকায় ঠিকই মসজিদে মেয়েদের আলাদা জায়গা থাকে। আর আমাদের দেশে খুবই কমসংখ্যক মসজিদে মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা আছে।

পবিত্র বায়তুল্লাহ শরিফ ও মসজিদে নববিতে মেয়েদের নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। জামাতে নামাজ পড়ার কায়দা-কানুন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকায় হজে গিয়েও বরকত লাভে বঞ্চিত হচ্ছেন নারীরা। অনেকে কুরআন-হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার দোহাই দিয়ে যার যার কক্ষে নামাজ আদায় করেন। হাতে সময় থাকার কারণে গল্পগুজব ও বাজারে গিয়ে কেনাকাটায় সময় ব্যয় করেন। এ চিত্রটি বড়ই করুণ। রাসুল (সা.) বাজারকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহর হাবিব (সা.)-এর ওফাতের পর মেয়েরা সাজগোজ করে মসজিদে যাতায়াত করতো, তা দেখে মা আয়েশা (রা.) বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'যদি রাসুল (সা.) বর্তমানে মেয়েরা কী করছেন তা দেখতেন তবে তিনি মেয়েদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন।'

এ থেকেও বোঝা যায় রাসুল (সা.)-এর সময় মেয়েরা মসজিদে যেতেন। মেয়েদের গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা যাতে সমান সংখ্যক সওয়াবে ভাগীদার হয় সে জন্য রাসুল (সা.) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন : 'নারীদের ঘরে নামাজ আদায় করা বৈঠকখানায় নামাজ আদায় করার চেয়ে উত্তম। নারীদের থাকার ঘরে নামাজ আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামাজ আদায় করা উত্তম।'– (আবু দাউদ)। এই হাদিসটি তাদের জন্যই প্রযোজ্য হবে যারা সব সময় পর্দার সঙ্গে গৃহেই বসবাস করেন, অর্থ উপার্জনের জন্য যারা ঘরের বাইরে বের হন না। মেয়েদের মসজিদের মূল ভবনে প্রবেশের বিপক্ষে একটি দুর্বল হাদিস পাওয়া গেছে। বিতর্কের সমাপ্তি টানার জন্য হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) মিরপুরের পূর্ব মনিপুর এলাকায় বাইতুর রহিম নামে একটি মসজিদ তৈরি করে গেছেন। তিনি মসজিদের ওজুখানার ওপরের তলায় (যা মসজিদের মূল ভবনের আওতায় পড়ে না) বেশ বড় আয়তনবিশিষ্ট কক্ষে মেয়েদের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সড়ক থেকে নারীরা সরাসরি এ কক্ষে প্রবেশ করেন। মেয়েদের পৃথক পথ থাকার কারণে তারা অধিক সংখ্যায় আসেন। তারা এখানে জুমার নামাজ, শবেবরাত, শবেকদর, তারাবিহ ও দুই ঈদের নামাজে শামিল হয়ে সাংসারিক জীবনে প্রচুর শান্তি ও প্রশান্তি অর্জন করেন।

এলাকাটিতে আগে বিভিন্ন রকম অসামাজিক কাজকর্ম হতো। হযরত জৌনপুরি (রহ.) আশির দশকে ওই এলাকায় এসে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া মসজিদকে উন্নয়ন করে বিশাল মসজিদ কমপ্লেক্সে পরিণত করে গেছেন। তিনি জানতেন মসজিদে নারীদের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাঁর নিরলস সাধনার ফলে এলাকার অপরাধ দূর হয়ে গেছে। তিনি সশরীরে বর্তমান থাকতেই এলাকাটির নামকরণ করা হয় নুরানিপাড়া। বিভিন্ন বয়সের প্রচুর মেয়ে নামাজ পড়তে এসে নানারকম ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়ে বাড়ি ফেরেন। এ ব্যবস্থার প্রভাবে এলাকাটিতে শান্তি বিরাজ করছে। এ মসজিদটিকে আমরা দেশের রোল মডেল হিসেবে নিতে পারি।

আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরা ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। মসজিদে গিয়ে ওয়াজ-নসিহত ও খুতবা শুনে তারা অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে ও ভবিষ্যতেও পারবে। ওই বিষয়ে বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করে পরিবার তথা গোটা সমাজের উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হতে পারছে এবং ভবিষ্যতেও পারবে। জাগতিক শিক্ষার এই চরম উৎকর্ষের যুগে মুসলিম নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করে ইসলামি ধ্যান-ধারণার প্রতি উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো দরকার। কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে হবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। ধর্মের গোঁড়ামি বাদ দিয়ে সঠিক বার্তা সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। দেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে নারীদের নামাজ পড়ার জন্য আলাদা অংশ বানানোর কাজে জনমত গঠন করতে হবে। তাহলে পরিপূর্ণ পর্দা পালন সাপেক্ষে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন নারীরা। এভাবেই আমাদের মুসলিম নারী সমাজ কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়ে বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও চর্চা করে আত্মার খোরাক পেয়ে সমাজে শান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দেবেন একদিন।

আত্মার গহিনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (১৯৩৫ - ২০১৫) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং সাজিলিয়া সুফি তরিকার একজন মুর্শিদ ছিলেন। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রওজা মোবারক পবিত্রভুমি ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত। এই লেখাটি তার 'মান 'আরাফ নাফসাহু 'আরাফ রাব্বাহু' বইটি থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন সাদিক মোহাম্মদ আলম।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

তাকওয়া

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ হলো খোদাকে ভয়, সম্মান করা ও পরহেজগারি যা আসে খোদাভক্তি থেকে। সাধারণ মানুষের জন্য তাকওয়া হলো যেকোনো পাপ চিন্তা এবং পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা। অন্যদিকে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য তাকওয়া অর্থ অন্তরকে একমাত্র আল-হক ব্যতীত যাবতীয় অন্য বস্তু থেকে চিন্তামুক্ত রাখা। জেনে রাখা প্রয়োজন যে তাকওয়া বান্দাকে অর্জন করতে হয় এবং যে কারণে এটি অর্জনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সকল নির্দেশনার জন্য এটা প্রযোজ্য যে যখন কেউ সেই নির্দেশনা বরাবর কাজ করে তখন সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বান্দা সে মাকামের অধিকারী হয়।

তাকওয়াকে দুভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি হলো আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য, তাঁকে সেভাবে সমীহ করা যেরকম সমীহ তাঁর প্রাপ্য এবং যাবতীয় মন্দ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। দ্বিতীয় ভাগটি হলো তিনি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তার যতটুকু আমাদের সাধ্য ততটুকু করার।

তাকওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে:

১) প্রথম স্তরটি সাধারণ মানুষদের জন্য যেখানে সত্তাকে যাবতীয় নির্দেশ অমান্য করা থেকে বিরত রাখা এবং এটি বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহজনক কাজ এবং বিধিনিষেধকে মেনে চলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর আরেক অর্থ হলো ভালো কাজের মাধ্যমে নিজের মন্দ কাজগুলোকে পরিশুদ্ধ করা।

২) জৈবিক তাড়নাযুক্ত নফস মানুষের জৈবিক চেতনা, অনুভূতি, গতি এবং শক্তি প্রদান করে থাকে। এটি একটি আদিম বস্তু যা শরীরের ভেতরে জেগে ওঠে। যখন এটি শরীরে ভেতরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই প্রকাশ পায় তখন এটি দেহকে জাগ্রত করে; কিন্তু যখন কেবল অভ্যন্তরীণভাবে কাজ করে তখন এটি ঘুমের জন্ম দেয় আর যখন এর পরিসমাপ্তি ঘটে তখন মৃত্যু আসে। সুনিপুণ ও প্রবল প্রজ্ঞাময় মহান স্রষ্টা কারিগরের সুমহান সৃষ্টিলীলা!

৩) নিজেকে প্রকাশমান নফস কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর বিভিন্ন স্তরে নাম হলো আদেশকারী নফস, নিজেকে দোষারোপকারী নফস, অনুপ্রাণিত নফস, তৃপ্ত এবং তৃপ্তিকারী নফস এবং পরিপূর্ণ নফস। এর বিভিন্ন গুণের কারণে এর বিভিন্ন নাম প্রদান করা হয়। যখন এটি কেবল জৈবিক তাড়নাদ্বারা পরিচালিত হয় তখন এটি আদেশকারী নফস (*নফস আল আম্মারা*)।

ওয়া মা উবাররিউ নাফসি ইন্না আন নাফসা লাআম্মারাতুন বিস সুউই ইল্লা মা রাহিমা রাব্বি। ইন্না রাব্বি গাফুরুর রাহিম–

আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চই মানুষের নফস অবশ্যই মন্দের দিকে আকর্ষিত, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল কুর'আন ১২:৫৩)

এটি যখন আল্লাহর আদেশ-নিষেদের সীমা মেনে চলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে কিন্তু কিছু কিছু ত্রুটি তখনো থেকে যায় এ অবস্থায় এটিকে বলা হয় *নফস আল লাওয়াম্মা* বা দোষারোপকারী নফস, যেটি ভুলত্রুটি করে ফেললে বিবেকের তাড়নায় দংশিত হয়।

ওয়া লা উশসিমু বিন নাফসি আল লাওয়ামাতি–

এবং শপথ করছি দোষারোপকারী নফসের (আল কুর'আন ৭৫:২)

যখন এর কেবল জৈবিক তাড়না ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে, আত্মা নফসের ক্ষুধার বিপরীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পবিত্র জগতের দিকে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে এটি পবিত্র জগৎ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে আরম্ভ করে এ অবস্থায় আত্মাকে বলা হয় *নফস আল-মুলহাম্মাহ* বা অনুপ্রাণিত নফস।

ফা'আলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা–

এবং তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন (নফসকে) তাকওয়ার দিকে (আল কুর'আন ৯১:৮)

এ অবস্থায় নফস প্রেম এবং ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর স্তরে এসেও নফসের ভেতরে কিছু আদেশকারী নফসের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা বা বাধা থাকে। এই বিশৃঙ্খলাও যখন দূরীভূত হয়ে যায় নফসের আরো পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে এবং জৈবিক তাড়নার আর কোনো প্রবলতা থাকে না নফসের ওপরে– এ অবস্থায় নফসকে বলা হয় *নফস আল মুতমাইন্নাহ* বা শান্ত ও নিরাপদ আত্মা।

আত্মার আরো উর্ধ্বারোহণের ফলে যখন নফস আরো বেশি মাত্রায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করে এবং সকল ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে তখন সেই আত্মাকে বলা হয় পরিতৃপ্ত আত্মা বা নফস আর রাদিয়া।

ইয়া আইয়্যুহান নাফসু মুতমাইন্না
আরজি ইলা রাব্বি রাদিয়াতান মারজিয়াতান–

হে প্রশান্ত চিত্ত নফস! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো- সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হও (আল কুর'আন ৮৯:২৭,২৮)

যখন এই স্তরের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তখন আত্মা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ের ওপরে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এরূপ আত্মার অধিকারীদের ওপরে নির্দেশনা আসে মানুষের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং তাদের পথ দেখানো এবং পরিশুদ্ধ করার কাজের জন্য। এমতাবস্থায় এরূপ আত্মাকে বলা হয় বিশুদ্ধ বা সম্পূর্ণ আত্মা (*নফস আল কামিলাহ*)।

(চলবে)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।